Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 89
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 83 - 89
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের কবি শাহবারিদ খানের সৃষ্টিকর্ম : বিশ্লেষণী অধ্যয়ন

হুমায়ুন কবির
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম
Email ID: hkm4all@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Medieval period, Bengali literature, Shah Barid Khan, Janganama, drama, poetry, society, culture.

Abstract
The 16th century poet Shah Barid Khan is the author of three poems, 'Vidyasundar', Rasul Bijoy' and 'Hanifar Digbijay'. The poem 'Vidyasundar' is full of dramatic qualities, and the dialogues of the characters are dramatic. The poet also mentioned it as 'Natgiti' in his poem. Natgiti were also important in medieval social life from the point of view of women's education. His second poetry is the story of war, the poem 'Rasul Bijoy', for the purpose of spreading Islam. Although the background of the poem is foreign, it has domestic social and cultural environment also. In the poem 'Rasul Bijoy', hidusism is expressed and it says poet's non-communal thinking. In the poem, the eternal patriarchy is shown in the character of Raja Jayakum. In the poem, we see female character Jaygun, who is immersed in weapons of war. Poet also expressed romantic character through fairy in his poem. The poet used rhythm, simile, ornamentation in his poem to enhance his writing.

Discussion

ষোড়শ শতাব্দীর কবি সাবিরিদ খান বা শাহবারিদ খান[১] রচনা করেন 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসুল বিজয়' ও 'হানিফার দিগ্বিজয়' নামে কাব্য। প্রাপ্ত কাব্যগুলি যেমন কলেবরে ক্ষীণ, তেমনি খণ্ডিত। খণ্ডিত হবার কারণে কবির আত্মপরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া যায় না। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের 'বিদ্যার পণ প্রচার'' অংশে বিধৃত কবির পূর্ব-পুরুষদের পরিচয়ই কবি-পরিচয়ের মুখ্য উৎস। 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য' গ্রন্থে মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২ খ্রি.) কবিকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।[২] কবি সাবিরিদ খানের পুথি আবিষ্কার করে সারস্বত সমাজে প্রথম তুলে ধরেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩ খ্রি.)। রোমান্টিক প্রণয় ও জঙ্গনামাধর্মী কাব্য তিনি রচনা করেন। এই সাহিত্য ধারার তিনিই একমাত্র আদৃত কবি নন। 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসুলবিজয়' কাব্যের আরও একাধিক কবিকৃত কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন কবি কঙ্ক, দ্বিজ শ্রীধর, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছেন। 'রসুল বিজয়' রচনা করেন সৈয়দ সুলতান, সেখ চান্দ প্রমুখ কবি। এইসব কাব্যের সঙ্গে সাবিরিদ খানের কাব্যের পার্থক্যের একটি নির্দিষ্ট দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়নি, কবিকৃত ত্রয়ী কাব্যের বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে কাব্যকৃতি নির্ণয়ের

প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সেজন্য আমাদের প্রবন্ধের শিরোনাম পরিকল্পিত হয়েছে— "মধ্যযুগের কবি সাবিরিদ খানের সৃষ্টিকর্ম : বিশ্লেষণী অধ্যয়ন"। এই আলোচনায় বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'শা'বারিদ খানের গ্রন্থাবলী'-কে আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এক

কবি সাবিরিদ খানের প্রথম রচিত গ্রন্থ 'বিদ্যাসুন্দর'। কাব্যটির সারকথা হল রত্নাবতীর রাজা গুণসার ও রানি কলাবতী দেবী পার্বতীর বরে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন, নাম রাখেন সুন্দর। কাব্যের নায়ক সুন্দর কাঞ্চিদেশের রাজা বীরসিংহ ও রানি শীলাদেবীর একমাত্র কন্যা বিদ্যাবতীর রূপের বিবরণ ভাট মুখে শ্রবণ পূর্বক মুগ্ধ হয়ে পরিণয়ের মনোবাঞ্ছায় কাঞ্চিদেশে উপস্থিত হয়ে এক মালিনীর গৃহে আশ্রয় নেন, এরপর পুথি খণ্ডিত। কাব্যটিকে ভণিতায় কবি 'নাটগীতি' বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যে কাঞ্চিদেশের মালিনী ও নায়ক সুন্দরের সংলাপধর্মী কথোপকথন নাট্যগুণান্বিত। যেমন—

সুন্দর— "পুছিএ স্বরূপে সুবদনি বোল মোরে।
পুষ্পমালা দেঅ তুহ্মি কার কার তরে।।"[৩]
মালিনী— "সুকুমারী বিদ্যাবতী আছিল অবোলা।
সে অবধি যোগাই কুসুম্ব পঞ্চমালা।।"[৪]
সুন্দর— "পন্থশ্রম শান্তি ভেল তুয়া মিষ্টালাপে।
প্রমোদা, প্রমোদে বাসাখানি দেঅ মোকে।।"[৫]

কাব্যে রত্নাবতী কুমার সুন্দর ও ভাট মাধবের সংলাপ নাটকীয় ভাব বহন করে। কাব্যের নাট্যগুণ সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

> "ইহাতে নাট্যকলা প্রস্ফুট না হইলেও, অস্ফুট নহে। প্রত্যেকটি বর্ণনা যেন এক একটা দৃশ্যের চিত্র। ফলে, কাব্যখানিতে নাটকীয় গুণ ফুটিয়া উঠায় ইহা একটি 'নাট্য-কাব্য' হইয়া উঠিয়াছে।"[৬]

নারীশিক্ষার দিক থেকেও নাট্যগীতিটি মধ্যযুগীয় জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ। কাঞ্চীরাজ বীরসিংহের কন্যা তথা নায়িকা বিদ্যাবতীর পাঁচ বছর পূর্ণ হলে একমাত্র কন্যাকে শিক্ষার জন্য গুরু মহাশয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কাব্যপঙ্‌ক্তিগুলি হল—

"পঞ্চম বরিষ কালে   পঠিতে কুমারী বালে
গুরুস্থানে সমর্পণ কৈল।
শুনিমাত্র শিখে পাঠ   লজ্জিত সকল চাঠ
পঢ়িয়া বিদ্বান বড় হৈল।।"[৭]

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধনী পরিবারের অন্তঃপুরের নারীদের শিক্ষিত করে তোলা হত তার পরিচয় এখানে আমরা পাই। অভিজাত ধনাঢ্য পরিবারের নারীদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে শিক্ষাপ্রদান করা হত। কিন্তু এখানে বিদ্যাবতী রাজকন্যা হলেও গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে দেখি 'গোপীচন্দ্রের গান'-এর ময়নামতী, 'পদ্মাবতী' কাব্যের সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতী প্রমুখদেরও।

দুই

সাবিরিদ খানের দ্বিতীয় কল্পনাপ্রসূত কাব্য 'রসুল বিজয়'। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কল্পিত যুদ্ধবিষয়ক জঙ্গনামা কাব্য 'রসুল বিজয়'। 'রসুল বিজয়' পুথিটি খণ্ডিত। কাব্য কাহিনির অনুসরণে বোঝা যায় কাব্যটি কলেবরে ক্ষীণ। সাবিরিদ খানের 'রসুল বিজয়' হজরত মুহম্মদ মুস্তফার দিগ্‌বিজয় কালের একটি ঘটনা নিয়ে রচিত। এই কাব্যের আগে কবি জৈনুদ্দিন বা জয়েন উদ্দিন 'রসুল বিজয়' কাব্য লিখেছিলেন। দুটি কাব্যের কোনটিরও সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায়নি। এছাড়া আরও কয়েকজন কবির 'রসুল বিজয়' কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন সৈয়দ সুলতানের 'রসুল বিজয়' (ষোড়শ শতক), শেখ চান্দের 'রসুল বিজয়' (সপ্তদশ শতক)।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 89
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'রসুল বিজয়' কাব্যের আদি কবি হলেন জৈনুদ্দিন বা জয়েন উদ্দিন। জৈনুদ্দিনের কাব্যের নাম 'রসুল বিজয়' বলে পরবর্তী সময়ে এই ধারার কাব্য রচয়িতাগণ তাঁদের কাব্যের নামের সঙ্গে 'বিজয়' শব্দটি যোগ করেছেন বলে মনে হয়। আধুনিক যুগে যেমন - 'নীলদর্পন' (দীনবন্ধু মিত্র : ১৮৬০ খ্রিঃ) নাটকের নামের অনুকরণে 'চা-কর দর্পণ নাটক' (দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : ১৮৭৫ খ্রিঃ), 'জেল দর্পণ নাটক' (দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : ১৮৭৫ খ্রিঃ), 'টাইটেল দর্পণ' (প্রিয়নাথ পালিত : ১৮৮৪ খ্রিঃ), প্রভৃতি বহু দর্পণ গ্রন্থ রচিত হতে দেখেছি; তেমনি ছেলে ভুলানো রূপকথা গল্প সংকলন গ্রন্থ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৭ খ্রিঃ) 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৮ খ্রিঃ) ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'-র (১৯০৯ খ্রিঃ) অনুকরণে পাই 'ঠাকুরমার ঝোলা' (শ্যামাচরণ দে : ১৯১৮ খ্রিঃ), 'ঠাকুরদাদার ঝোলা' (শ্যামাচরণ দে : ১৯২০ খ্রিঃ), 'ঠাকুরমার রূপকথা' (চণ্ডীচরণ গুপ্ত : ১৩৩২), ঠাকুরদাদার রূপকথা' (কালীমোহন ভট্টাচার্য : ১৯২২ খ্রিঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ। আবার, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখতে পাই কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অবলম্বনে 'পবনদূত' (ধোয়ী), 'বকদূত' (অজিত ন্যায়রত্ন), 'কাকদূত' (গৌরগোপাল শিরোমণি), 'গোপীদূত' (লম্বদর বৈদ্য), 'অনিলদূত' চন্দ্রদূত' প্রভৃতি দূত বিষয়ক কাব্য। এরূপ বহুল প্রযুক্ত আরও দুটি কাব্য ধারার নাম পাই আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি 'মঙ্গল', অপরটি 'চরিত' কাব্য।

উদাহৃত চারজন কবিকৃত চারটি কাব্যই ফারসি বা উর্দু থেকে বাংলায় অনুসৃত হয়েছে। বলাবাহুল্য 'রসুল বিজয়' মৌলিক কাব্য নয়, তাই বলে আক্ষরিক অনুবাদও নয়। পূর্ববর্তী কোনো ফারসি কাব্যের স্বাধীন অনুসৃতি। কবি (জৈনুদ্দিন) বলেছেন—

"বিস্তর আছিল যুদ্ধ কেতাবে লিখন।
কিঞ্চিত লিখিল লোকে জানিতে কারণ।।"[৮]

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে মাতৃভাষায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশীয় ভাষায় কাব্যরচনা করেছেন কবিগণ।

বিদেশীয় পটভূমিতে রচিত কাব্যে স্বদেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতি : সাবিরিদ খানের 'রসুল বিজয়' কাব্য ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্য মুসলমানদের দিগ্‌বিজয় কাহিনি বর্ণিত হলেও আমরা সেদিনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিভিন্ন আঙ্গিক ফুটে উঠতে দেখি তবে তার পটভূমি আরব দেশ নয়, আমাদেরই স্বভূমি বাংলাদেশ (সেদিনের অবিভক্ত বাংলা)। সেদিনের সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে ধনী গৃহে মেয়ে মহলে বাঁদি শ্রেণির ধনি বা বৌ-ঝি সমেবেত নাচ করতেন। ধনী গৃহে উৎসব অনুষ্ঠানে নাচিয়ে গাইয়ে বাজিয়ে বেশ্যা আনা হত, কারণ তাঁরা প্রশিক্ষিত হতেন। এই কাব্যে নবির সেনাপতি খাবাইল ও জয়কুম তনয়ার বিবাহে এইরকম বর্ণনা পাই। সেখানে রাজবালার বিবাহ উপলক্ষ্যে নানারকম বাজনা ঝংকৃত হচ্ছে—

"তথি ব্যাল্লিশ বাজন বাজএ ঘনে ঘন
সব হুলুস্থুল আতি।"[৯]

এই বাজনার সঙ্গে নৃত্যও পরিবেশন হত, আয়োজনের আড়ম্বরে রাজঅন্তঃপুর রীতিমতো উৎসবে মুখরিত। বিয়ের উৎসব উপলক্ষ্যে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে নবীন সাজে সজ্জিত করা হচ্ছে, কেবল বাড়ির বাহির প্রাঙ্গন নয়, অন্তঃপুরও বর্ণময় করে সাজানো হচ্ছে। যেহেতু জয়কুম রাজা সেহেতু তাঁর এই কাজের মধ্যদিয়ে রাজোচিত বিলাসিতা প্রকাশ পাবে এটাই স্বাভাবিক—

"রাজ অন্তঃপুর রচিত সুন্দর
সকল সুবর্ণমএ।"[১০]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'জগতীমঙ্গল' কাব্যে দেখি বেহুলার পিতা বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁদের সমগোত্রীয় বণিকদেরই নিমন্ত্রণ করেছেন। শাহ্‌বিরিদ খানের কাব্যেও দেখি রাজা জয়কুম তাঁর তনয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে রাজ্যের মহৎ ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করেছেন। সেদিন সমাজে পান সুপুরি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতি ছিল। জয়কুম রাজাও সেই রীতি মেনে নিমন্ত্রণ করেন—

"সুগন্ধি তাম্বুল বাটি ঘরে ঘরে
বোলাইয়া সবরাজ।"[১১]

বাঙালি নারীর প্রসাধন সামগ্রী কস্তুরি, কুমকুম, কাজল, মেহেদি ইত্যাদি জয়কুম রাজার তনয়ার সাজসজ্জা প্রসঙ্গে লক্ষ করি। স্নানের পূর্বে হলুদ, কুসুম, চন্দন দ্বারা গাত্রলেপন ইত্যাদি ধনী গৃহের নারীদের মধ্যে প্রচলিত একটি রীতি। তারপর সুবাসিত জল দ্বারা স্নান করানো হত এবং কনেকে বিচিত্র বসনভূষণে সাজানো হত—

"সুবাসিত জল করাইয়া গোসলি
ভূষণ ভূষে কর্ণে অঙ্গে।"[১২]

এই কাব্যে আমরা রাজকুমারীর অঙ্গের কোনো নির্দিষ্ট অলংকারের নাম পাইনা ঠিকই, তবে সেদিনের সামাজিক ইতিহাস লক্ষ করলে বোঝা যায় তখন মেয়েরা হাতে কঙ্কণ, বলয়া, চুড়ি; নাকে কোর, নাকমাছি; কানে কানফুল, ঝুমকা, কানবালা, কুন্তল; পায়ে নূপুর, ঘুঙুর; হাত-পায়ের অঙ্গুলে আংটি, বাহুড়ে, বাজু, হাতের পাতার উপর আঙুল সংলগ্ন রতন চূড় ইত্যাদি ধারণ করতেন। কিন্তু রাজতনয়া নিজের আভিজাত্যের মর্যাদা বজায় রাখতে বিলাসবহুল প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে থাকবেন।

নারীদের কেশবিন্যাস সজ্জায় দেখা যায়, খোপারও বিচিত্র রকমের গড়ন ছিল এবং নানা ছাঁদের বেণী ও কবরী হত, সেই গড়ন ও গঠন অনুযায়ী নামেরও বৈচিত্র্য ছিল। যেমন চিত্রল, বেহারি, কানাড়ি, দেবমহলী প্রভৃতি। এদের মধ্যে কর্ণাট, দেশীয় 'কানাড়ি' ছাঁদে বাধা কবরীর কদর ছিল বেশি তা বোঝা যায় জয়কুম তনয়ার কেশ বিন্যাসের গঠন—

"কুটিল কুন্তল করিএ উচ্চল
কবরী কানড়ী ছন্দে।"[১৩]

সেসময় পুরুষরাও অলংকার পরিধান করতেন। পুরুষরের অলংকার রূপে বাহুতে কবচ ও বাজু এবং গলায় তাবিজ, হাতে বলয় প্রভৃতি ধারণ করতেন। এই কাব্যে মুসলমান যোদ্ধার পোশাকের নিম্নরকম বর্ণনা পাই—

"শতমন লোহা গঠ কবচ ভূষিত।
চল্লিশমনের টোপ কাঞ্চনে জড়িত।।"[১৪]

'রসুল বিজয়' কাব্যে আহার্য সামগ্রীর বর্ণনা তেমন করে পাই না, তবে জয়কুমের তনয় খাখান যুদ্ধের সময় ভাত, পান, বিচিত্র ব্যঞ্জন প্রভৃতি আহার্য গ্রহণ করেন— "ভাত খাই তুষ্ট হৈলা নৃপতি নন্দন"[১৫]। তৃপ্তি সহকারে ভাত খাওয়ার পর মুখ শুদ্ধির জন্য পান খাওয়ার রেওয়াজ বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত। এখানে ভাত খাওয়ার পর মুখ শুদ্ধির জন্য জয়কুম তনয়কে তাম্বুল সেবন করতে দেখা যায়। এটাকে এখানে নেশা জাত দ্রব্য রূপে না-ধরে বিলাসিতার অঙ্গ রূপে ধরা যেতে পারে— "কর্পূর তাম্বুল পুনি করিল গ্রহণ।"[১৬] এই আহার্য তালিকা বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ সন্ধান : মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। বিভিন্ন রোমান্টিক প্রণয় আখ্যান, বৈষ্ণব পদাবলি প্রভৃতিতে মুসলমান কবিগণ নানা হিন্দুশাস্ত্রীয় শব্দ, লোকাচার, রীতিনীতি প্রভৃতি ব্যবহার করে উদার মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। আলোচ্য কাব্যের কবিও উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তিনি মুসলমান হলেও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন এবং তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'রসুল বিজয়' কাব্যেও তিনি হিন্দু সংস্কৃতি তুলে ধরে অসাম্প্রদায়িক মননের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন বিবাহসভায় রাজা জয়কুম তনয়া বাঙালি হিন্দু নারীর মতোই সিঁথিতে সিন্দুর পরেছেন—

"শিথেত সিন্দুর সুর বিকিরত
শোভিত সুন্দর ভালে।"[১৭]

আসলে অনেক দূরবর্তী দেশ আরব, রূপকথার ভাষায় বলা যায় সাত সুমদ্র তেরো নদীর ওপারের একটি দেশ। তাই সেদেশের মানুষের সমাজজীবন, জীবিকা বা আচার সম্বন্ধে দেশের লেখকের বা মানুষের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা তখন ছিল না। কাজেই কাব্যে আরবীয় পরিবেশ পটভূমি অনুপস্থিত এবং বাংলার পরিচিত সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই আরবীয় পটভূমি নির্মিত হয়েছে। এজন্য এই কাব্য হয়ে উঠেছে বাঙালির কাব্য।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 89
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিন

সাবিরিদ খানের তৃতীয় কাব্য আবিষ্কার করে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ নামকরণ করেন ‘হানিফা ও কয়রাপরী’। আহমদ শরীফ ‘হানিফার দিগ্বিজয়’ নামে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।[১৮] কাব্যটি জঙ্গনামাধারার যুদ্ধ বিষয়ক কাব্য। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে কাব্যকাহিনিতে যুদ্ধাস্ত্রের ঝংকারে দৃপ্ত হয়ে উঠেছে নারী চরিত্র জয়গুণ। কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এটি। জয়কুমের বীরত্বের আস্ফালনের পাশে পরিকন্যা কয়রাপরি চরিত্রের মানব সন্তানের সঙ্গে প্রেমের চিত্র অলৌকিকতা মন্দ্রিত।

বিধর্মীদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কাহিনিতে মোহাম্মদ হানিফা স্ত্রী জয়গুণের পতিপ্রেম, নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম কিংবা পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ তাঁকে প্রকৃত বীরঙ্গনা করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ওয়াকিল আহমদ (জন্ম ১৯৪১ খ্রি.) বলেছেন - “জয়গুণ যথার্থ বীরঙ্গনা।”[১৯] সহীরাম রাজবালা জয়গুণ মোহাম্মদ হানিফার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করে পরিণয় প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হন। কাহিনিতে জয়গুণ চরিত্রে পতিব্রত্যানারীর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন অবয়বে চিত্রার্পিত। প্রচার যুদ্ধের দিগ্‌বিজয়কালে সহীরাম রাজ্যে রাজার কূটচক্রান্তে হানিফা পরিখার মধ্যে পতিত ও আবদ্ধ হন। যুদ্ধে মৃত “গজ অশ্ব উট সৈন্য” প্রভৃতি কূপে নিক্ষেপ করে অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন সহীরাম রাজ যেন উঠতে না-পারেন আলীর নন্দন মোহাম্মদ হানিফা। কূপে পতিত, বদ্ধ হানিফাকে উদ্ধার করতে সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে ত্বরিত আসেন স্ত্রী জয়গুণ। সহীরাম রাজা জয়গুণের পিতৃদেব। পিতৃপক্ষের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়গুণ পতিকে উদ্ধার করেছিলেন—

“আমীরের বাক্য শুনি জয়গুণ চলিলা।
পিতৃ সৈন্য মধ্যে জয়গুণ প্রবেশিলা।।
জয়গুণের মুখ যদি সে সৈন্য দেখিলা।
উজির সহিতে সৈন্য রণে ভঙ্গ দিলা।।”[২০]

নারীবাহিনী নিয়ে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে পতিকে মুক্তি করায় যেমন পতিপ্রেম চরিত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে, অনুরূপ তাঁর বীরঙ্গনা মূর্তিও এখানে সমুজ্জ্বল। সমালোচক জয়গুণকে তুলনা করেছেন ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র ‘ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালা’র বীরঙ্গনা সখিনার সঙ্গে।[২১] স্বামীকে উদ্ধারের জন্য পিতার সৈন্যদলের সঙ্গে পুরুষ বেশে লড়াই করে সখিনা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

জঙ্গনামাধর্মী কাহিনিতে কবি হানিফা ও জয়গুণের দাম্পত্যের পাশে রোমান্সধর্মী প্রণয়চিত্র অঙ্কন করেছেন পরি চরিত্র সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। শাহাপরি নন্দিনী কয়রাপরী মোহাম্মদ হানিফার প্রতি অনুরক্তা এবং এই অনুরাগ একমুখী। কবি হানিফার প্রতি কয়রাপরীর অনুরক্তের ব্যাকুল অভিব্যক্তি বোঝাতে বলেন— “দিনে একবার মুখ না দেখিলে মরে”। যুদ্ধের অলৌকিক কাহিনিতে কবি মানবসন্তানের সঙ্গে পরি কন্যার প্রেম দেখিয়েছেন যা বাস্তবতা বর্জিত অলৌকিক। কয়রাপরীর প্রেমের নিষ্ঠতা শুধু নয়, হানিফার প্রতি তাঁর আকর্ষণও প্রবল ছিল। “চতুর্দশ অব্দ” ছায়ার মতোই তাঁর সান্নিধ্যে থাকেন পাওয়ার আশায় এবং সুযোগ পেয়ে প্রাণপ্রিয়কে উড়িয়ে নিয়ে চলে যান নিজ শহর রোকাম। এব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর সহচরী পরিগণ। অবহিত হওয়া যায় এতে কয়রাপরীর প্রেমের তীব্রতা। সমগ্র কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিসর ‘কায়রাপরী কর্তৃক হানিফা হরণ’ অংশে অনুরক্তা নারী কয়রাপরীর প্রেমচিত্র অঙ্কিত।

ছন্দ ও অলংকার : সাহিত্যশিল্পী সাবিরিদ খান ছিলেন আঙ্গিক সচেতন কুশলী-কবি। মধ্যযুগীয় প্রচলিত রীতির ধারায় পয়ার, ত্রিপদী, খর্ব ছন্দ, মালিছন্দ ব্যবহার করেছেন। ‘খাখানের যুদ্ধ’ [চতুর্থ যুদ্ধ] বর্ণনায় কবি প্রয়োগ করেছেন খর্বছন্দ—

“অলক্ষিতে আলিকে সান্ধিয়া দিব্য শর।
হস্তের ধনুক কাটি পাড়িলা তৎপর।।
লজ্জিত খাখান বীর ধরি আর ধনু।
শরজালে আবরিল আমীরের তনু।।”[২২]

ছন্দ ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগেও সমুজ্জ্বল শিল্পকুশলী কবি সাবিরিদ খান। কয়েকটি শব্দালংকারের উদাহরণ—

অনুপ্রাস— "সাক্ষাৎ হইয়া দেবী দিলা বরদান।
সন্ততি জন্মিব তোর ভুবন প্রধান।।"[২৩]

উদাহৃত চরণ দুটির অন্ত্যে 'আন' ধ্বনি সাম্যে মিল সূচিত বলে এটি অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারের দৃষ্টান্ত।

বক্রোক্তি— "কথাতে সিংহের নারী কুকুরের ভোগ্য।"[২৪]

বক্তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতেই প্রশ্নের মধ্যে উত্তর অবহিত হওয়া যায়। এখানে প্রশ্ন সিংহের নারী কোথায় কুকুরের ভোগ্য? বলার ভঙ্গিতে উত্তর বোঝা যাচ্ছে, না— কোথাও ভোগ্য নয়। এজন্য এটি কাকুবক্রোক্তির দৃষ্টান্ত।
কয়েকটি অর্থালংকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

উপমা— "বজ্রসম মহাগদা ধরি বীরবর।"[২৫]
রূপক— "অস্ত্র সমে হস্ত ছেদে ভুজ সমে ধনু
নিরন্তর শরজালে আবরিল তনু।।"[২৬]

কাব্যপঙ্‌ক্তির 'শর', 'জাল' উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পিত হয়েছে বলে এটি রূপক অলংকার। আবার, প্রথম চরণের 'ধনু' ও দ্বিতীয় চরণের অন্ত্যশব্দ 'তনু'-এর মধ্যে ধ্বনিসাম্যে মিল সূচিত বলে এটি অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার।

উৎপ্রেক্ষা— "নবীন জলধর যেন গগনে গর্জেএ।।"[২৭]

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের দুটি বিভাগ— বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা। এখানে 'যেন' সংশয়বাচক শব্দে উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের সংশয় সূচিত বলে এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার। কবির মণ্ডনকলাগুণ সম্পর্কে সমালোচক আজহার ইসলাম (জন্ম ১৯৪৪ খ্রি.) বলেছেন—

> "ছন্দ, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা কবিতাবলয়ের এসব অপরিহার্য অঙ্গ তাঁর শিল্পচেতনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়। ...কাব্যকলা-মণ্ডিত শিল্পচেতনার রীতিসম্মত বিকাশ একাব্যেও যথারীতি বিদ্যমান।"[২৮]

উপসংহার : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর গতানুগতিক ধারার বাইরে রচিত কবির প্রথম গ্রন্থ 'বিদ্যাসুন্দর'-এর নায়িকা বিদ্যা বিদুষী এবং তিনি কাঞ্চীপুরের রাজবালা, অন্যদিকে বর্ধমানের রাজবালা রূপে বিদ্যাবতীকে পাই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। 'রসুল বিজয়' খণ্ডিত কাব্যে সাবিরিদ খান নবির মাহাত্ম্য প্রচারের অতিরঞ্জিত বর্ণনায় রসুলের বিজয়গাঁথা তুলে ধরে এই কাব্যধারার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নবির মানবীয় গুণের সঙ্গে তিনি যে যোদ্ধা হিসেবেও অসাধারণ রণকুশলী কাব্যের বর্ণনায় তা ধরা পরে। চিরন্তন পিতৃসত্তার স্বরূপ হিসেবে উঠে আসে রাজা জয়কুম চরিত্র। তাঁর সঙ্গে আমরা মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি.) 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১ খ্রি.) কাব্যের রাবণ চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষণ করতে পারি। রাবণ যেমন লঙ্কার অধিপতি, জয়কুম তেমনি ইরাকের অধিপতি তথাপি যুদ্ধে আপন পুত্রের মৃত্যু জনিত বিলাপে রাজাসত্তা নয়, পিতৃসত্তা বড়ো হয়ে উঠেছে। জয়কুম রাজকুমারীর বিবাহের সঙ্গে বাঙালি হিন্দু সমাজের বিবাহরীতির সাযুজ্য, কিংবা বাঙালির জীবনাচার আরবীয় পটভূমি নিয়ন্ত্রণ করে নির্মিত হয়েছে বিদেশীয় পটভূমিতে বাঙালি কাব্য।

Reference :

১. শরীফ, আহমদ, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৮০
২. হক, মুহম্মদ এনামুল, 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মে ২০১৩, পৃ. ৫৬
৩. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), 'শা'বারিদ খানের গ্রন্থাবলী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৭৩, পৃ. ২০
৪. তদেব, পৃ. ২০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 89
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. তদেব, পৃ. ২০
৬. হক, মুহম্মদ এনামুল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৮
৭. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯
৮. হক, মুহম্মদ এনামুল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৮
৯. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯০
১০. তদেব, পৃ. ৯০
১১. তদেব, পৃ. ৮৯
১২. তদেব, পৃ. ৯০
১৩. তদেব, পৃ. ৯১
১৪. তদেব, পৃ. ৪৫
১৫. তদেব, পৃ. ৭৪
১৬. তদেব, পৃ. ৫৯
১৭. তদেব, পৃ. ৯১
১৮. শরীফ, আহমদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭৭
১৯. আহমদ, ওয়াকিল, ‘বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান’, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, দশম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ১৯৪
২০. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৮
২১. আহমদ, ওয়াকিল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৪
২২. শরীফ, আহমদ (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৭
২৩. তদেব, পৃ. ৪
২৪. তদেব, পৃ. ১৪৬
২৫. তদেব, পৃ. ৪৪
২৬. তদেব, পৃ. ৫৬
২৭. তদেব, পৃ. ৪৯
২৮. ইসলাম, আজহার, ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৯৯, পৃ. ৩৩

Bibliography :

আহমদ, ওয়াকিল, ‘বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান’, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, দশম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২৪
ইসলাম, আজহার, ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৯৯
শরীফ, আহমদ, ‘বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য’ (১ম খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০২৪
শরীফ, আহমদ, ‘মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ’, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০০
হক, মুহম্মদ এনামুল, ‘মুসলিম বাংলা-সাহিত্য’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মে ২০১৩